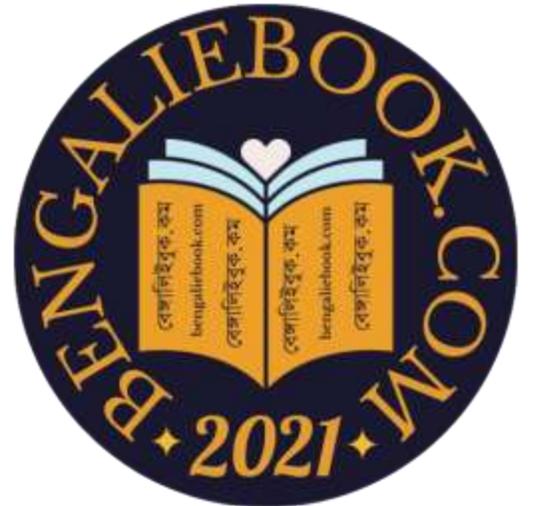


প্রবন্ধ

স্বপ্নচরিত্র

বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড



সূচিপত্র

• উপক্রমণিকা	3
• দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? ..7	
• তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা.....	11
• চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা.....	15
• পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল	19
• ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা.....	25
• সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা.....	34
• অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা.....	37
• নবম পরিচ্ছেদ—মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত.....	41
• দশম পরিচ্ছেদ—প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী.....	47
• একাদশ পরিচ্ছেদ—নির্বাচনের ফল.....	50
• দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত.....	53
• ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?	57
• চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ.....	66

- পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ..... 74
- ষোড়শ পরিচ্ছেদ—হরিবংশ..... 79
- সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্য..... 81

উপক্রমণিকা

মহতস্তুমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
 যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্নে নমঃ॥
 মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘণার কথা শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ!” বলিয়া আমরা ঘণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণোরাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবান্কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রতধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্ছরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব,

যাঁহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্মদেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্বগুণাশ্রিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্মের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।

ইহা ভিন্ন আমার এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্বে* “ধর্মতত্ত্ব” নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এইঃ—

“১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি।

সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।”

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“শিষ্য!...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মানুভূতি এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।

* * *

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু! মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।”

পুনশ্চঃ—

“অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগকে গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগের মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারা ইহা সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টীয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, “অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা” প্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট - ইঁহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি, সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি

পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্মুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়— যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই।”

এই তত্ত্বটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

* ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপে ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি?

আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি?

আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়ঃ—

- (১) মহাভারত।
- (২) হরিবংশ।
- (৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিতগুলিতে আছেঃ—

- (১) ব্রহ্মপুরাণ।
- (২) পদ্মপুরাণ।
- (৩) বিষ্ণুপুরাণ।
- (৪) বায়ুপুরাণ।
- (৫) শ্রীমদ্ভাগবত।
- (১০) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

(১৩) স্কন্দপুরাণ।

(১৪) বামনপুরাণ।

(১৫) কূর্মপুরাণ।

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহা নাই—পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তি রচিত। সকলই মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত। এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথা।

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ। এক দিকে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই আমাদের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ সকল একজনে করিয়াছেন; সকলই কলিয়ুগের আরম্ভে

হইয়াছে; সেও পাঁচহাজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন। এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত। তাঁহারা যত্নপূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে—হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া—সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্‌ডিয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসন্ সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলি বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক মিস্ত্রীর। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney

সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহার নিজবুদ্ধিতে এত করে।

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অনুবর্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অনুবর্তী। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

“ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্।

পূর্ববৃত্তকথায়ুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে || ”

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটসকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অ বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,—সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অ বিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব

ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিতে হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিন্দ্য প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া

আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে “Moor” বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই।

কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন্ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই

কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে ঘটয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিথিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জার্মানির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে “কালকের ছেলে”। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না।* এখানে জার্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বানবেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন

আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মেগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জার্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

অন্যান্য পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকারঃ—

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না।

(২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র।

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরম্ভের ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময় বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তিমাতে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪,৯৯২ বৎসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যিক। তজ্জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবদি কবিকল্পনা মাত্র কি না? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না?

* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his times and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observation.

History of Sanskrit Literature, English Translation, p. 186. Trubner & Co., 1882.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল

প্রথমে দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যিক। ৪,৯৯২ বৎসর পূর্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে, ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিনীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোর্নদ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোর্নদ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

সপ্তর্ষীগাণ্ড যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।

তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যেতে যৎ সমৎ নিশি ॥

তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম।

তে তু পারিক্ষিত কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ॥

তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।

—৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মঘানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন।[১] সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য অতি দুর্গম-সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে-ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা তাহাকে বলেন “Precession of the Equinoxes.” এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩১/৩ অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র-পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে-শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্টলি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেনঃ—
“The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of the precession of the equinoxes: This was by assuming an imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in Great Bear.*** The seven stars in the Great Bear being called the Rishis, the circle so assumed was called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of lunar asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index.”

Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65.

এইরূপ গণনা করিয়া বেণ্টলি যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্ববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন

কালাবধারণ-চেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্বাষাঢ়ায়।

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৪। ২৪। ৩৯

তার পরে, শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে—

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১২। ২। ৩২

মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা—মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ x ১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর।

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণু পুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্বশ্লোক এইঃ—

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসহস্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৪। ২৪। ৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—

“মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্বারিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি।”

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য[২] নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেকজন্দর ও সিলিউকস্ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে

মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ সিলিউকস্কে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে তিনি অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের শিবিরमध्ये প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেক্জন্দর ৩২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব ঐ ৩১৫ অব্দের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুদ্ধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। $৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০$ খ্রীঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না—“চন্দাকৌ যত্র সাক্ষিণৌ।”

সকলেই জানে যে, বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য থাকেন, সেইস্থান দুইটিকে ত্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন পরিবর্তন হয় (Solstice) । ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্যতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

“মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুদ্ধিষ্ঠির।”

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্বদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত-বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং আয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দু নাম “অয়নচলন”। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ-পূর্বাঙ্গে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতির্বিদ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাক্সেলাইন্ ১৮০২ খ্রীঃ অঙ্গে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতির্বিদ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের[৩] কোন্ দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে “মাঘেহয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ” কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে

রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্যন্ত রবিষ্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।

1 নক্ষত্র এখানে অশ্বিন্যাতি।

2 বিখ্যাত চাণক্য।

3 সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয় মত

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না। কোলব্রুক সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্‌ষ্টোন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাদ্বর্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথা মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন—কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না।

প্রথমতঃই লাসেন্ সাহেবকে ধরিতে হয়—কেন না, তিনি বড় লক্ষপ্রতিষ্ঠ জর্মাণ পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ—পাণ্ডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র ইউলিয়ম্‌স্ বাবু

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

কুরু নামে একজন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তদংশীয় রাজগণকে কুরু বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও ঐ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। পাঞ্চগলেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্চগল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পাঞ্চগল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চগলগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

এতদূর পর্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চগলগণই বটে। মহাভারতে কৌরবদিগের প্রতियুদ্ধকারী সেনা পাঞ্চগল সেনা, অথবা পাঞ্চগল ও সৃঞ্জয়গণ[1] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। পাঞ্চগলরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপতি। পাঞ্চগলরাজপুত্র শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীষ্মকে নিপাতিত করেন। পাঞ্চগলরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবাচার্য দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাণ্ডবেরাও কুরু; তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্ট্রপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম, এবং কৌরবাচার্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য। যদি এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাঁহারা কখনই দুর্যোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না—কেন না, তাঁহারা ধর্মান্বিতা ও ন্যায়পর। কুরুপাঞ্চগলের বিরোধ পাণ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব

মিলিত এবং দ্রোণাচার্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং পাঞ্চালরাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন।

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ বলিয়া যে, পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাণ্ডবের শ্বশুর পাঞ্চালাধিপতি ধার্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই;—কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। [2] ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি—ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণ্ডুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল।

পাণ্ডবেরা পুনর্বীর বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ববৈর প্রতিশোধজন্য এ আক্রমণ, এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ্য মাত্র কি না, স্থির করিয়া বলা যায় না। যাই হৌক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব।

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ সব কথা বলিবার উপরিলিখিত পণ্ডিতেরা অন্য কারণ নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ—আবার চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলো গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনল্পপরবর্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নামগন্ধ নাই—কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল না।

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেকজন্দরের নামগন্ধ নাই—অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেকজন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক ইতিহাসবেত্তা তদ্ব্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখতিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্‌হাজদিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহা না হয়, তবে একা মিন্‌হাজদিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা অবিশ্বাসযোগ্য কিসে?

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অর্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাণ্ডব অর্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অর্জুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জুন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম।

কথাটা হাসিয়া উড়িয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাহ্মণে, অর্জুন নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে। যেমন অর্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই

ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র ফাল্গুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা;[3] অর্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত; ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম, এ কথা কোন শিক্ষিত পাঠক বিশ্বাস করিবেন না। আবার অর্জুন শব্দে শুক্ল। মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুক্ল নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও শুক্লবর্ণ নহে। উভয়ে নির্মলকর্মকারী শুদ্ধ, পবিত্র; এজন্য উভয়েই অর্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জুন, শতপথব্রাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে—“অর্জুনো বৈ ইন্দ্রো যদস্য গৃহ্যনাম”; অর্জুন ইন্দ্র; সেটি ইহার গৃহ্য নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অর্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐক্যস্থাপনজন্য, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব “গৃহ্য” অর্থে “mystic” বুঝিয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন।

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জুন। আবার কুরচি গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অর্জুন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, কেন না, ইহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া আমাদের কাছে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্ডবদিগের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্বত্য দস্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব পাঁচজন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে, “ফিরিঙ্গী” শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, যে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয় “Eurasian”, নয় “European”—“Frank” শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, “Frank” জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব।[4]

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু

তিনি পাণ্ডব প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডব প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জুনাди সব রূপকমাত্র। যথা—অর্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঐ পঞ্চ জাতির একীকরণ—সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে—বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক—যে রূপক ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থে আর কিছুই নাই।

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর ‘রম্’ ধাতু পাওয়া, এবং সীতার নামের ভিতর ‘সি’ ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জার্মান পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মানুষ—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। একজন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে

এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্লেব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্‌রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে ‘লস্’ ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক (Talboys Wheeler), সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেঘের জলপরিমাপেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না। তিনি বলেন,—হাঁ ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা সামান্য মাত্র—

“The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against the Aborigines.”

টল্‌বয়স্‌ হুইলার সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্যপ্রিয় লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু হুইলার সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকপীরের গান শুনিয়া রামায়ণভ্রমে অশ্রমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবাদের সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার

কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি।

1 সৃঞ্জয়েরা পাঞ্চগলভুক্ত-তাহাদিগের জাতি।

2 বিদুর বৈশ্যাজাত।

3 এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ।

□ “বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্বতবাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, p. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে থাকিয়া পরিবর্ধিত হন।

এবং পাণ্ডোঃ সূতাঃ পঞ্চঃ দেবদত্তা মহাবলাঃ।* *

* * বিবর্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥

আদিপর্ব। ১২৪। ২৭-২৯।

এইরূপে পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র * * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবর্ধিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সলিনস্ নামে গ্রীক গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশে উত্তরাংশে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ডু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্ডু বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ডু-নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনি-সূত্রের বার্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ডু শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।□। লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহ্লীকাদি উত্তরদিকস্থ কতকগুলি

জনপদের সহিত পাণ্ডু দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

“পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীক * * * এতে পৈশাচদেশাঃ স্যু।”

হরিবংশে দক্ষিণদিকস্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ডু দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ শ্লো) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ডু দেশ। শ্রীমান্ উইলসন্ বিবেচনা করেন; ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV., pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন, এই সমস্যা পূরণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডু কথং তস্যেতি চাপরে।

আদিপর্ব। ১। ১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, “বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহারা কিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন?”

ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ। অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়-দিগের মতের অবলম্বী।

5 পাণ্ডোর্ড্যন্ বক্তব্যঃ-বার্তিক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহুগৃষ্টীয়াসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌররবপ্রব্ধেষু। ৬। ২। ৩৮
অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ
‘ভারত’। অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন আর
কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber
সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভারতবংশ। এটি কেবল তাঁহার গায়ের জোর।
এমন প্রয়োগ কোথাও নাই।

পুনশ্চ, পাণিনিসূত্র—

“গবিযুধিভ্যাং স্থিরা।” “গবিযুধিভ্যাং স্থিরা।” ৮। ৩। ৯৫

গবি ও যুধি শব্দের পর স্থিরা শব্দের স স্থানে ষ হয়। যথা—গবিষ্ঠিরঃ, যুধিষ্ঠিরঃ।

পুনশ্চ,—

“বহুচ ইজঃ প্রাচ্যভরতেষু।” ২। ৪। ৬৬

ভরতগোত্রের উদাহরণ “যুধিষ্ঠিরাঃ।” [1]

পুনশ্চ,—

“স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরাভ্যশ্চ।” ৪। ১। ১৭৬

পাওয়া গেল “কুন্তি”।

পুনশ্চ,—

পুনশ্চ,— “বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্।” ৪। ৩। ৯৮

অর্থাৎ বাসুদেব ও অর্জুন শব্দের পর ষষ্ঠ্যর্থ্যে বুন্ হয়।

পুনশ্চ,—

“নভ্রাণ্নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু।” ৬। ৩। ৭৫

ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল।

দ্রোণপর্বতজীবন্তাদন্যতরতরস্যাম্। ৪। ১। ১০৩

“দ্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বখামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামেই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বখামা প্রভৃতির নাম পাণিনি সূত্রে পাওয়া যায়।

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক।

ভারতদেবী Weber সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই, – স্বয়ং গোল্ডষ্টুকর পাণিনির অভ্যুদয়কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এ স্থান নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে। যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা করেন, তাঁহারা গোল্ডষ্টুকরের গ্রন্থই ইংরাজিতে পড়িতে পারেন। তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, এজন্য Weber সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ডষ্টুকরের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না।

গোল্ডষ্টুকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের[২] আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। ঋক্, যজুঃ, সামসংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রীঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, ঐ শেষ; খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাণিনির সময় খ্রীঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না।

Max, Muller, Weber, প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোল্ডষ্টুকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্বেই মহাভারত প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, “বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্” এই সূত্রে ‘বাসুদেবক’ ও ‘অর্জুনক’ শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায়, বাসুদেবের উপাসক, অর্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্রপ্রণয়নের পূর্বেই কৃষ্ণার্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।

- 1 উদাহরণটি সিদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বলা কর্তব্য।
- 2 মহাভারতে ‘বৌদ্ধ’ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ[1] শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বাসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই ঋগ্বেদসংহিতার অনেকগুলি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। তাঁহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বাসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব।

পাণিনির সূত্রে ‘বাসুদেব’ নাম আছে—সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বাসুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বাসুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া যায়—পুঞ্জাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। বাসুদেবকে কবিকল্পনা বলিতে হয়, বল-কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাঁহারা নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসীপ্রসার যুদ্ধ হইতে মোলটকেকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। Gravelotte, Woerth, Metz, Sedan, Paris প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Moltke হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে নির্বাহিত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

ভূইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, ভূইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণপাসনা প্রবর্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্বাঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসূর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসূর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসূর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব নিষ্কামধর্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই—

“তদ্বৈতদেঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোহন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।”

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।”

এই ঘোর ঋষির পুত্র কণ্ঠ[২]। ঘোরপুত্র কণ্ঠ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের ঋষি। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্যন্ত; এবং কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত সূক্তের ঋষি। এবং কণ্ঠের অন্য পুত্র প্রক্ষণ ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫০ পর্যন্ত সূক্তের ঋষি। এখন নিরুক্তকার যাক্ষ বলেন, “যস্য বাক্যংস ঋষিঃ।” অতএব ঋষিগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র এবং পৌত্রগণ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতায় অষ্টম মণ্ডলে ৮৫। ৮৬। ৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুর্লভ। কিন্তু কৃষ্ণ ঋত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না, ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্নাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাঁহারা ঋত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদ-সূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র ঋষি আছেন; অতএব ঋত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিতে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদসংহিতার অনুক্রমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আগ্নিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপনিষদ্ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে কৌষীতিকিব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আগ্নিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই; আগ্নিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি ঋত্রিয়ও আগ্নিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাগ্নিরসঃ স্মৃতাঃ।

রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতো দ্বিজাতয়ঃ॥ -৪ অংশ, ২। ২

কিন্তু এই রথীতর রাজা সূর্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদু, যযাতির পুত্র, কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

এবং ইক্ষ্বাকুবংশাদ্বি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।-৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ।

কথাটা খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রঘ্ন মথুরাজয় করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, “বাসুদেবর্জুনাভ্যাং বুন্” এই সূত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্ষসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

1 কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খুঁজিয়া পাই নাই।-আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ যে পাণিনির পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক ঋষির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তন্নিম্ন অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরবাসী; সুতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাণিনির কোন সূত্রে “কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসূত্রে “বাসুদেব” নাম যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য ঠিক। তাহাই আছে।

2 এই কণ্ঠ শকুন্তলার পালকপিতা কণ্ঠ নহেন। সে কণ্ঠ কাশ্যপ; ঘোরপুত্র কণ্ঠ আগ্নিরস।

নবম পরিচ্ছেদ—মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

আমরা এতক্ষণ যা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম এই যে, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মহাভারতের কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব?

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা, বা মহাভারত কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না বলিয়াই, তাঁহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মর্মার্থ যদি এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন অংশ আদিমমহাভারতভুক্ত, তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকিলেও, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব।

আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের

সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

২য়-অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্ পর্বে কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

আদি	৮৮৮৪
সভা	২৫১১
বন	১১৬৬৪
বিরাট	২০৫০
উদ্যোগ	৬৬৯৮
ভীষ্ম	৫৮৮৪
দ্রোণ	৮৯০৯
কর্ণ	৪৯৬৪
শল্য	৩২২০
সৌপ্তিক	৮৭০
স্ত্রী	৭৭৫
শান্তি	১৪৭৩২
অনুশাসন	৮০০০
আশ্বমেধিক	৩৩২০
আশ্রমবাসিক	১৫০৬
মৌসল	৩২০
মহাপ্রস্থানিক	৩২০

স্বর্গারোহণ ২০৯

ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পুরাইবার জন্য পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেনঃ—

“অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।

খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম্ ॥

দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোকশতানি চ।

খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা ॥ ॥ ”

অর্থাৎ “এইরূপে অষ্টাদশপর্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব কথিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া যায়ঃ—

আদি ৮৪৭৯

সভা ২৭০৯

বন ১৭, ৪৭৮

বিরাট ২৩৭৬

উদ্যোগ ৭৬৫৬

॥

ভীষ্ম ৫৮৫৬

দ্রোণ ৯৬৪৯

কর্ণ ৫০৪৬

শল্য ৩৬৭১

সৌপ্তিক ৮১১

স্ত্রী ৮২৭

||

শান্তি ১৩, ৯৪৩

অনুশাসন ৭৭৯৬

আশ্বমেধিক ২৯০০

আশ্রমবাসিক ১১০৫

মৌসল ২৯২

মহাপ্রজ্ঞানিক ১০৯

স্বর্গারোহণ ৩১২

খিল হরিবংশ ১৬, ৩৪৭

মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্বসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তয়-এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্বশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন।

“ততোহধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।

অনুক্ৰমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপৰ্বণাম্ ॥ ”

এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পর্বসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়।

৪র্থ-পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪, ৮৩৬ শ্লোকে পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আন্তীকপর্বাধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।

৫ম,-ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শुकদেবকে অধ্যয়ন করান।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ধারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥

ততোহধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণাম্ ॥

ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।

ততোহন্যেভ্যোহনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥ –আদিপর্ব, ১০১-১০৩।

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুর্বিংশতি-সহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পাঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, ঐ অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্গলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুষ্যলোকে পাঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপারঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধর্গলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই ষষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ—প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী

আমাদিগের বিচার্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না?

মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নির্বাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। যথা— আদালতের জন্য প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন (Law of Evidence), বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy) এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্রও আছে। উপস্থিত তত্ত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা—

১ম,—আমরা পূর্বে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদের প্রথম সূত্র।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সর্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সর্ধশতের অপেক্ষা ৯টি

শ্লোক বেশী হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য।

৩য়,—যাহা পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায়।

৪র্থ,—সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

৫ম,—মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীৰুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৭ম,—যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই পর্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ—নির্বাচনের ফল

মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া বিচারপূর্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পরমার্থিক দার্শনিকত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহাই তাহাই দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুতমাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজনশূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথমস্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না।

কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টত্ব বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্বপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই।—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্তি;* কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়, বনপর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্বের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চান্তরে আদিপর্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

* স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং—শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪অ। ২৫।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—অনৈসর্গিক বা অতিপ্রবৃত্ত

এতদূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থূলতঃ এইঃ— যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। তবে, আমাদের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,—Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ঋষিদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে—

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমোন্। সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকধৈব স্বমাতুজম্ ॥
প্রভূর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ। সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ ॥ —
আদিপর্ব। ৬৩অ। / ৯৫-৯৬

অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশিতা করিলেন।*

তাহা হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাণ্ডবদিগের প্রপৌত্র।

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতেছেন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা।

তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন, এবং ঋষিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবাঃর এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন।

তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়সিকী সংহিতা নহে। (২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।

সেই সাবধানতার জন্য আবশ্যিক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নহি। যেমন একজন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটা ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন ঐশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল

দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, ‘আমি দেখি নাই—শুনিয়াছি,’ তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না।

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে দেখিলে হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ি বা বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তি দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাল্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বখামা ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড দধ্ব হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বখামার আদেশানুসারে, উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন?

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কর্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি

মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তির দ্বারা! কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম সম্পাদন করিবেন, তবে তাঁহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্বকর্তা সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়-যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি বা ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাঁহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না?

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ কি সম্ভব?

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ-পর্ব বেবর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে আছে—
“সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল-সূত্র-ভারতমহাভারত-ধর্মচার্যাঃ। তাহা হইলে
সুমন্তুসূত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার, এবং পৈল ধর্মশাস্ত্রকার।

সম্রাট পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ

হওয়া কি সম্ভব?

বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে—(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের খ্রীষ্টীয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদের এই স্কুল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমাদের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে।

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর নির্গুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নিৰ্গুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিৰ্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নিৰ্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিন্তাবৃত্তি নাই, যদ্বারা আমরা নিৰ্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিৰ্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নিৰ্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই।[1] মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিৰ্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। “চতুষ্কোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু “চতুষ্কোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হৰ্বট স্পেন্সর এত কাল পরে নিৰ্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর (“Something higher than personality”) তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নিৰ্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিৰ্গুণ বলিলে স্রষ্টা বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্‌ঝকিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমানির্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না? যিনি এই জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান্, তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মনুষ্যকলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন্য

পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহুয়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ-গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত, – তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্তমধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান, তাঁহার কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদকীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে : –

“পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে || ”

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। “ধর্মসংরক্ষণ” কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্মসাপেক্ষ।[2] অতএব কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্মকে স্বধর্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?

এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্দীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্যও এই প্রকার।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতিপুরুষঃ ॥ ১৯

কর্মণেব হি সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানাবাণ্ডমবাণ্ডব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।

মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশ্ ॥ ২৩।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্

সঙ্করস্য চ কৰ্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪। গীতা, ৩ অ।

“পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্মরক্ষার্থ কর্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্ৰাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠান করিতেছি।[৩] যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অনুবর্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।”

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থান নাই প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক

ব্যাপার আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই গতি জগৎকর্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপণের বা কার্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্মের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা অতিক্রমপূর্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করি; তাহার কারণও পূর্বপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতির সাহায্যেই স্বকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রীষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে,

তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু-মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতির কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিম্বদন্তীর সত্যমিথ্যানির্বাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।

অজ্ঞান্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুখংতি ॥

মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।

তস্যারিপক্ষপাণে কোহয়মুদ্যমবিস্তরঃ ॥

তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনুবর্ততে।

কুর্বন্ বলবতা সন্ধিঃ হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ ॥

সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।

করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥

মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ।

লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সৎপ্রবর্ততে ॥ -৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮

“জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও

সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্মের অনুবর্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্বক দণ্ডপাত করেন কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটয়াছিল।”

আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তির দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।[4] অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল।

বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্বীর স্মরণ করাই : –

১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

২। যাহা অতিপ্রাকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রাকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।

1 “Our concption of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us.”-Mansel, Metaphysics, p. 384

2 “মৃৎকৃত এই ধর্মের ব্যাখ্যা ধর্মতত্ত্বে দেখ।

3 কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

4 ‘It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men-acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as

ascribe a divine character to the heroes, and of the unskillful manner in which these passages are often introduced and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress.” Lassen’s Indian Antiquities quoted by Muir.

“In other places (অর্থাৎ ভগবদগীতা পর্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however, is the work of various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated.” Wilson, Preface to the Vishnu Purana.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,—দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা। আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক।

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি;—

১ম,—এই ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাঁচ রকম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, দুইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র।

২য়,—এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কূর্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বর্ণনা পুনঃ পুনঃ কখন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব।

৩য়,—আর যদি এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মধ্যে, মধ্যে

মধ্যে, এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে।

৪র্থ—বিষ্ণুপুরাণে আছে;—

আখ্যা নৈশচাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।

পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥

সুমতিশ্চাগ্নিব্রহ্মাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।

অকৃতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ॥

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।

লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃগাং মূলসংহিতা ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক।

পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করিলেন। সুমতি, অগ্নিব্রহ্মা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ, সাবর্ণি— তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাঁহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে;—

ত্রয়্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।

শিংশপায়নহারীতৌ ষড়্ভৈ পৌরাণিকা ইমে ॥

অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।[1]

একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগাম্ ॥

কশ্যপোহহধ্বঃ সাবর্ণী রামশিষ্যোহকৃতব্রণঃ।

অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্ছত্রারো মূলসংহিতাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক।

ত্রয়্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক।
বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন, –

আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপোহং কৃতব্রণঃ।

পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে; –

প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

সুমতিশ্চাগ্নির্ব্রহ্মাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংসপায়নঃ ॥

কৃতব্রতোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।

শাংসপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানাস্তু সংহিতাঃ ॥

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ একও ব্যক্তির লিখিত এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্তমান পুরাণ সকলের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে।

“পুরাণ” অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বালায়ন সূত্রে, অথর্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্মশাস্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত।

প্রাচীন পৌরাণিক কথা সকল ঐরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিম্বদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে ঐ সকল কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক সূক্ত সকল ঐরূপে সঙ্কলিত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম সংহিতাত্ৰয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য ‘ব্যাস’ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ‘ব্যাস’ তাঁহার উপাধিমাত্র-নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসঙ্কলনকর্তা, তাঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ ঐ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী। হইতে পারে যে, এই জন্যই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদান্তসূত্রকার ব্যাস, এমন কি-পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্তা। তিনি যেমন বৈদিক সূক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নূতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব কোন্ অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব? একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে;—

“রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।

সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্ ॥

যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।

তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥ ”

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রাহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে। যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ করা অপূর্ব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়।

উইল্‌সন সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন:—

ব্রহ্মপুরাণ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দী।

পদ্মপুরাণ ,, ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।[2]

বিষ্ণুপুরাণ ,, দশম শতাব্দী।

বায়ুপুরাণ সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী।

নারদপুরাণ ,, ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের গ্রন্থ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ,, নবম কি দশম শতাব্দী।

অগ্নিপুরাণ ,, অনিশ্চিত; অতি অভিনব।

ভবিষ্যপুরাণ ঠিক হয় নাই।

লিঙ্গপুরাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক্ ওদিক্।

বরাহপুরাণ ,, দ্বাদশ শতাব্দী।

স্কন্দপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ।

বামনপুরাণ ৩।৪ শত বৎসরের গ্রন্থ।

কূর্মপুরাণ প্রাচীন নহে।

মৎস্যপুরাণ পদ্মপুরাণেরও পর।

গারুড় পুরাণ

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়।

ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ

পাঠক দেখিবেন, ইহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়, বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া যাঁহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্যয় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইলসন্ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

“যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্স্যতে তে

বর্হণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষেণাঃ।” – ১৫ শ্লোক।

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের গোপবেশ ছিল। ইন্দ্রধনুর সঙ্গে উপমেয় কৃষ্ণচূড়াঙ্কিত ময়ূরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, না রামায়ণে আছে?—কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইলসন্ সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল।

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব-গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তখন চলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ

লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্” ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্বগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্‌সন্ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে।

- 1 ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব। “বৈশম্পায়নহারীতৌ” ইতি পাঠান্তরও আছে।
- 2 তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপদ্মের সময়-নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে। এই দুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব।

১ম,—ব্রহ্মপুরাণ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

২য়,—বিষ্ণুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

৩য়,—কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত ঐক্যবিশিষ্ট। এবং অনেক

ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ ঐক্য আছে। এ স্থলে, পূর্বকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীন কালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন।

যদি আমরা বিলাতী ধরনে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহ হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বিংশাধ্যায়ে মগধ রাজাদিগের বংশাবলী কীর্তিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের দ্বারা কলিকালের আরম্ভসময়ে কথিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের সমকাল বা পরকালবর্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না করিলে, পরাশরকথিত বলিয়া পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তিনি যে সকল রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যথা;— নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান, শকরাজগণ, অন্ধরাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে,—“নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপূর্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।”* এই গুপ্তবংশীয়দিগের সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে

মহারাজগুপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। ইঁহারা খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত—ইঁহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্তী। তাহা হইলে, এই পুরাণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ে রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ণুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা, “Percy Reliques,” অথবা রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত জ্যোতিষ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না।

তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে যে সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নূতন কল্পনাসংযুক্ত এবং অত্যাুক্তি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য।

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতদেবী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে।

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা পুরাণই নহে, – বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাঁহারা বলেন, “ভগবত ইদং ভাগবতং” এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভাগবত্যা ইদং ভাগবতং” এই অর্থ করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন—“ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্”। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পুরাণ নহে—দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মার্জিত রুচির পরিচায়ক। একখানির নাম “দুর্জনমুখচপেটিকা,” তাহার উত্তরের নাম “দুর্জনমুখমহাচপেটিকা” এবং অন্য উত্তরের নাম “দুর্জনমুখপদ্মপাদুকা”। তার পর “ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ” ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং Bournouf সাহেব “চপেটিকা,” “মহাচপেটিকা” এবং “পাদুকা”—র অনুবাদও করিয়াছেন। Wilson সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৌতূহল থাকে, তিনি Wilson সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। আমার মতের স্কুল মর্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যাঙ্কি দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত, এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই

তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছু সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাকি আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—হরিবংশ

হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনানুসারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যিক। মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ২৯।৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। ঐ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরিশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ ঐ শ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে তিন পর্ব পাওয়া যায়;—হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যর্ব। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্বের নাম মাত্র নাই, হরিবংশপর্বে ও ভবিষ্যপর্বে ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্বে ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে ঐ শ্লোক প্রবিষ্ট হইবার পরে বিষ্ণুপর্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

“অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটা পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য পর্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটা পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার

আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত করিলে লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে। আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।”

হরেস্ হেমন্ উইলসন্ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন;—
“The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subsequent to that of the major portion of the Mahabharata.”*

আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অল্পকাল-পরবর্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ব তাহাতে অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথা নিশ্চয়তা সম্পাদন অতি দুঃসাধ্য।

সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তায় হরিবংশের পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবন্ধু খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তের পূর্ববর্তী।

কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলসূত্র বলিলেও হয়। আমরা পরিপরিচ্ছেদে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

* Horace Hayman Wilson's Essays Analytical, Critical and Philosophical on subjects connected with Sanskrit Literature, Vol. I. Dr. Reinhold Rost's Edition.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসাদির পৌর্বাগম্য

উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।[1] ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থূলকথা। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution বাদের স্থূলকথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না—একাস্থিত্ব এবং বহুস্থিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা “Homogeneous” ছিল, তাহা পরিণতিতে “Heterogeneous” হয়। যাহা “Uniform” ছিল, তাহা “Multifarious” হয়। কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যদি শ্যামকে বলে, “আমি কাল রাতে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল,” তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যদুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, “রামের ঘরে কাল রাতে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।” তারপর ইহাই সম্ভব যে, যদু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাতে রাম ভূত দেখিয়াছিল,” এবং মধুও নিধুর কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।” এবং পরিশেষে বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতে দৌরাত্ম্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,—যেমন বিষ্ণু ধাতু হইতে বিষ্ণু। দ্বিতীয়াবস্থায়, রূপক—যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি, এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

তারপর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস-যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়।

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্বশী-পুরুষের উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্বেদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুরুষ, দুইখানি অরণিকার্ষমাত্র। বৈদিক কালে দিয়াশলাই ছিল না; চকমকি ছিল না; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্নি জন্য এ সকল ব্যবহৃত হইত না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্ঞিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বলিত “অগ্নিচয়ন”। অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্বেদসংহিতার (মাধ্যনন্দিনী শাখায়) পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, পঞ্চমে অপরখানিকে পূজা করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই:—

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম উর্বশী”। ৩।

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই। এজন্য উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে)

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম পুরুষ।” ৫। [2]

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু।

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। এখানে উর্বশী পুরুষ আর অরণিকার্ষ নহে; ইহারা নায়ক নাহিকা। পুরুষ উর্বশীর বিরহশক্তি। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্বশী (৫ম ঋকে) বলিতেছেন, “হে পুরুষ, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিন বার রমণ করিতে।” যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে! পুরুষকে উর্বশী “ইলাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। ইলার শব্দের অর্থ পৃথিবী।[3] পৃথিবীরই পুত্র অরণিকার্ষ।

মহাভারতের পুরুষ ঐতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুষ। উর্বশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু।[4] যজুর্মন্ত্র যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই

অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নুহুষের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু। যদু, যাদবদিগের আদিপুরুষ; পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্রাট।

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই, –

উর্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপের পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

আর একটি এইরূপ: –

পূর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত তাঁহার বিঘ্নার্থ কতিপয় অঙ্গুরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অঙ্গুরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অঙ্গুরাগণের উরু হইতে ইঁহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইঁহার রূপে মোহিত হইয়া ইঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাদিগকে ঐরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা (অর্থাৎ পুরুরবার পত্নী) হন।

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্বেদসংহিতার ৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। তারপর মহাভারত। তারপর পদ্মাদি পুরাণ।

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব তাহারও পৌর্বাপর্য এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

& সাহেবেরা বলেন, ঋগ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ঋক্বেদসংহিতার সকল সূক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে

প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ঋক্ষসংহিতায় এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ যে, ঋক্ষসংহিতায় এমন অনেক পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার করেন। অনেকগুলি ঋক্ষ সামবেদসংহিতাতেও আছে ঋগ্বেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র ঋক্ষসংহিতায় বেশী আছে কিন্তু ঋক্ষ সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্রও আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার একটি উদাহরণ।

! মক্ষমূলর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্বশী উষা, পুরুরবা সূর্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুর্মন্ত্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থ উপরে লিখিত হইল।

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পূতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক।

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু। পরে দেখি, পূতনা, যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পূতনা শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পূতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পূতনা “বালঘাতিনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; “অতিভীষণা”; তাহার কলেবর “মহৎ”; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী।[5] হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পূতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পূতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। যে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলো এক একটা লাঙ্গল দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য, পেটটা জলশূন্য হৃদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা পীড়া ক্রমশঃ

এত বড় রান্ধসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা।

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তারপর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তারপর হরিবংশ; তারপর ভাগবত।

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহার কাল এং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে “মধ্যম ফণার” কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য নাই বুঝিতে পারুন, বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সম্ভ্রষ্ট নহেন—একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন।

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে হরিবংশ, পরে ভাগবত।

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবো। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক, উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্বাপর্য এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন

না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিত্ত ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে—যথা স্যমন্তক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত।

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট। মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা[6] নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তুত।

1 সোহকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েষেতি।-তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ২ বল্লী, ৬ অনুবাক্।

2 সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ।

3 সর্পমাংসাৎ পশু ব্যাডৌ গোভূবাচস্তিড়া ইলা ইত্যমরঃ।

4 কখন কখন এই নাম “আয়ু” লিখিত হইয়াছে।

5 কোন অনুবাদকার অনুবাদে “রাক্ষসী” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই।

6 ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।